বয়কটের শরয়ী বিধান

কিছু অস্পষ্টতা ও তার জবাব

মূল:

মুফতি উবাইদুর রহমান মারদান

অনুবাদ:

আব্দুল্লাহ বিন বশির

শিক্ষক, মাদরাসাতু আলী রা.

পশ্চিমা বিশ্ব দীর্ঘ সময় ধরে মুসলিম ভুখণ্ডগুলোর উপর একের পর এক আগ্রাসন চালায়, যার ফলে মুসলিমদের পক্ষ থেকে তাদের বিরুদ্ধে অর্থনৈতিক বয়কটের দাবী উঠানোর প্রয়োজন দেখা দেয়। বর্তমানে ইজরাইল গাজা ও সেখানকার মুসলমানদের উপর যে নৃশংস বোম্বিং করছে এমতবস্থায় তাদেরকে কার্যকরভাবে ক্ষতিসাধনের একটি অন্যতম মাধ্যম হলো অর্থনৈতিক ও বানিজ্যিকভাবে বয়কট করা। শুধু অর্থনৈতিক বয়কটের মাধ্যমেই ফিলিস্তিনের সমস্যার সমাধানে সীমাবদ্ধ থাকা সঠিক নয়। তবে গুরুত্বের সাথে এই পদ্ধতি অবলম্বন করতে পারা মুসলিম হিসেবে নিজেদের জন্য গনিমত মনে করা উচিত এবং এর মাধ্যমে কার্যত কিছু উপকারও অর্জন করা সম্ভব। তো যাই হোক, আমার এই প্রবন্ধ লিখার উদ্দেশ্য হলো বয়কটের শরয়ী দৃষ্টিভঙ্গি ও শরয়ী অবস্থান স্পষ্ট করা।

যুদ্ধরত রাষ্ট্রের সাথে বানিজ্যের শরয়ী দৃষ্টিকোণ

যে সকল রাষ্ট্র মুসলমানদের বিরুদ্ধে যুদ্ধরত থাকে, তাদের সাথে এমন কোনো সম্পর্ক রাখা বৈধ নয়, যার ফলে তাদের শক্তি বৃদ্ধি পায়, এবং মুসলমানদের বিরুদ্ধে লড়াই করার শক্তি অর্জন হয়, বরং এ ক্ষেত্রে শরীয়তের মূল বিধান হলো এই,

১। যখন কোনো রাষ্ট্র পৃথিবীর কোথাও মুসলমানদের বিরুদ্ধে যুদ্বে জড়াবে, তখন ঐ রাষ্ট্রটি সকল মুসলমানদের বিরুদ্বে যুদ্ধে জড়িয়েছে বলেই ধর্তব্য হবে। শরীয়তের দৃষ্টিতে জাতীগত বা ভূখণ্ডগত বর্তমান যে পার্থক্য তা বিবেচ্য নয়।

২। এজন্য এমন রাষ্ট্রের সাথে অন্য সকল মুসলিম মুসলমানদের হারবের সম্পর্কই হবে। অমতবস্থায় প্রত্যেক মুসলমানের যার যতটুকু সামর্থ্য ও যোগ্যতা রয়েছে রয়েছে সে অনুযায়ী তাদের বিরুদ্ধে লড়তে হবে। আর যাদের কোনোরকমই শক্তি নেই তারা তো নিজ সমর্থের বাহিরে কোনো বিষয়ের মুকাল্লাফ হবে না ঠিক তবে তাদের জন্যও মুসলমানদের বিরুদ্ধে যুদ্ধরত রাষ্ট্রের সাথে বন্ধুত্বপূর্ণ সম্পর্ক রাখা জায়েয নয়।

শরহে সিয়ারে কাবির গ্রন্থে রয়েছে,

ولا بأس بأن يبيع المسلمون من المشركين ما بدا لهم من الطعام والثياب وغير ذلك، إلا السلاح والكراع، والسبي سواء دخلوا إليهم بأمان أو بغير أمان. لأنهم يتقوون بذلك على قتال المسلمين، ولا يحل للمسلمين اكتساب سبب تقويتهم على قتال المسلمين، وهذا المعنى لا يوجد في سائر الأمتعة. ثم هذا الحكم إذا لم يحاصروا من حصونهم، فأما إذا حاصروا حصنا من حصونهم فلا ينبغي لهم أن يبيعوا من أهل الحصن طعاما ولا شرابا ولا شيئا يقويهم على المقام. لأنهم إنما حاصروهم لينفذ طعامهم وشرابهم حتى يعطوا بأيديهم ويخرجوا على حكم الله تعالى، ففي بيع الطعام وغيره منهم اكتساب سبب تقويتهم على المقام في حصنهم، بخلاف ما سبق، فإن أهل الحرب في دارهم يتمكنون من اكتساب ما يتقوون به على المقام، لا بطريق الشراء من المسلمين، فأما أهل الحصن لا يتمكنون من ذلك بعد ما أحاط المسلمون بهم، فلا يحل لأحد من المسلمين أن يبيعهم شيئا من ذلك. ومن فعله فعلم به الإمام أدبه على ذلك لارتكابه ما لا يحل. (شرح السير الكبير ،كتاب سهمان الخيل والرجالة في الغنائم، باب هدية أهل الحرب)

মুসলমানরা মুশরিকদের সাথে কাপড়, খাদ্যজাতবস্তু ইত্যাদি ব্যবসা করতে কোনো সমস্যা নেই। তবে ঘোড়া, অস্ত্র ও গোলাম বিক্রি করতে

পারবে না। চাই মুসলমানরা সেখানে নিরাপত্তা নিয়ে প্রবেশ করুক বা নিরাপত্তা ছাড়া। কেননা এতে দারুল হারববাসী মুসলমানদের বিরুদ্ধে যুদ্ধে শক্তিশালী হবে। কোনো মুসলমানের জন্য এটা বৈধ নয় মুসলমানের বিরুদ্ধে তারা কাফেরদের শক্তি অর্জনের কারন হবে। আর এই বিষয়টি অন্যান্য বিষয়ে পাওয়া যায় না। (তাই সেগুলো বিক্রিতে কোনো সমস্যা নেই) আর যদি মুসলমানরা কাফেরদের কোনো দূর্গ অবরোধ করে তাহলে এই বিধান প্রযোজ্য হবে না। কেননা অবরোধ চলাকালীন তাদের নিকট খাবারদাবার বা ইত্যাদি এমন কোনো কিছুই বিক্রি করা জায়েয হবে না যার মাধ্যমে তারা দৃঢ় থাকবে। কেননা মুসলমানরা তাদের অবরোধ এজন্যই করেছে যে তাদের খাদ্যদ্রব্য শেষ হয়ে যাবে এবং তারা বাধ্য হয়ে আল্লাহর বিধানের সামনে বের হয়ে আসবে। আর খাদ্যদ্রব্য ও ইত্যাদি বিষয়গুলো তাদের কাছে তখন বিক্রি করার দ্বারা তারা দূর্গে অবিচল থাকার শক্তি যোগাবে। এর বিপরীতে যখন মুসলিমদের অবরোধ থাকবে না, তখন কাফেররা নিজেরাই মুসলিমদের থেকে ক্রয় ছাড়াই নিজেদের খাদ্য ও ইত্যাদি বিষয়ে শক্তি অর্জনে সক্ষম। (তাই তখন আর যুদ্ধের শক্তি জোগায় না এমন যেকোনো কিছু বিক্রিতে কোনো সমস্যা নেই।) আর মুসলমানরা দূর্গ অবরোধের পর তখন আর তাদের পক্ষে এমনটা সম্ভব নয়। তাই তখন কোনো মুসলমানের জন্য তাদের কাছে কিছুই বিক্রি করা জায়েয হবে না। সুতরাং কোনো মুসলমান যদি কিছু বিক্রি করে তাহলে শাসক জানতে পারলে তাকে নিষিদ্ধ কাজের জন্য শাস্তি দিবে।[1]

শরহে সিয়ারে কাবীরের উপরোক্ত বক্তব্য থেকে কয়েকটি বিষয় স্পষ্ট হয় যে,

[1] শরহুস সিয়ারিল কাবির ১/১২৪২

১। স্বাভাবিক অবস্থায় মুশরিকদের সাথে যুদ্ধাস্ত্র ছাড়া অন্য সব কিছু বেচা কেনা করার বৈধতা রয়েছে ।

২। আর যে সকল লেনদেনের কারণে মুসলমানদের বিরুদ্বে তারা শক্তি সঞ্চয় করতে পারবে এমন সকল লেনদেনই তাদের সাথে নাজায়েয। সুতরাং যখন মুসলমানদের কোনো জামাত কাফেরদের সাথে যুদ্ধরত অবস্থায় থাকে এবং কাফেরদের দূর্গ অবরোধ করে রাখে এমতাবস্থায় কোনো মুসলমানের জন্য তাদের সাথে কোনো ধরণের লেনদেন জায়েয নয়, চাই তা খাদ্য দ্রব্য হোক না কেনো ।

৩। যদি কোন ব্যক্তি এমতাবস্থায় তাদের সাথে যে কোন ধরণের লেনদেন করে তাহলে মুসলিম বিচারক তাকে উপযুক্ত শাস্তির সম্মুখীন করবে ।

বর্তমান প্রেক্ষাপট

এ ব্যাপারে কোন সন্দেহ নেই যে, বর্তমান সময়ের যুদ্ধসমূহ প্রচুর পরিমাণ খরচের সম্মুখীন হয়। সামান্য পুঁজিতে যুদ্ধ করা সম্ভব হয় না। কোনো রাষ্ট্র ততক্ষণ পর্যন্ত অন্য কোনো রাষ্ট্রের পূর্ণ যুদ্ধে জড়ানো সম্ভব হয় না, যতক্ষণ আশপাশের অন্যান্য রাষ্ট্রের সাথে তার অর্থনৈথিক সম্পর্ক ভালো হয়। আর বর্তমানে কোনো রাষ্ট্রই এতটা স্বয়ংসম্পূর্ণ নয় যে, তারা এককভাবে যুদ্ধে কোনো সম্মানজনক অবস্থায় যেতে পারে। অর্থনৈতিক ও বানিজ্যিক সম্পর্কই একটি রাষ্ট্রকে শক্তিশালী বানায়। এবং এই শক্তির উপর ভর করেই এক শক্তিশালী রাষ্ট্র অপর শক্তিশালী রাষ্ট্রকে জোরপূর্বক দখলের সক্ষমতা অর্জন করে। সুতরাং যখন এই বিষয়টি পরিষ্কার হয়ে গেলো যে, কোন রাষ্ট্র বা শক্তি যখন মুসলমানদের

বিরুদ্ধে যুদ্ধে অবতীর্ণ হয় এবং বানিজ্যিক সম্পর্ক স্থাপনের দ্বারা ঐ রাষ্ট্র আরো শক্তিশালী হয়ে ওঠে, এবং মুসলমানদের বিরুদ্ধে যুদ্ধে তাদের শক্তি আরো বৃদ্ধি পেতে থাকে এমন অবস্থায় ঐ যুদ্ধরত রাষ্ট্রের সাথে নতুন বানিজ্যিক যুক্তি করা বা পূর্বের চুক্তি বহাল রাখা কোনভাবেই জায়েয নয়।

একটি অসম্পূর্ণ বক্তব্য

কারো কারো পক্ষ থেকে উপরোক্ত মাসআলাকে এই শব্দযোগেও বলা হয়, "মুসলমানদের সাথে যারা যুদ্ধে লিপ্ত তাদের সাথে অর্থনৈতিক সম্পর্ক রাখা ঈমানি আত্মমর্যাদাবোধের সাথে সাংঘর্ষিক। দ্বীনি গাইরাতের তাকাজা হলো এমন রাষ্ট্রগুলোর সাথে বানিজ্যিক সম্পর্ক না রাখা উচিত।"

এই অভিব্যক্ত তো অবশ্যই সঠিক। আর বাস্তবই দ্বীনি আত্মমর্যাদাবোধের দাবীও এটাই যে, এমন রাষ্ট্রগুলোর সাথে সবধরনের সম্পর্ক ছিন্ন করা হবে। তবে সাধারণভাবে এই অভিব্যক্তিটি এই দৃষ্টিভঙ্গি থেকে পেশ করা হয় যে, "ফিকহি দৃষ্টিতে যদিও এই ধরনের রাষ্ট্রগুলোর সাথে ব্যবসায়ীক সম্পর্ক রাখায় কোনো সমস্যা নেই বরং বৈধ, তবে তা দ্বীনি গাইরাতের সাথে সাংঘর্ষিক।" অথচ এই কথাটি সঠিক নয়। এই কথা সঠিক না হওয়ার অন্যতম কারণ তো হলো, ফিকহি দৃষ্টিতেও এই ধরনের সম্পর্ক সহিহ নয়। উপরে শরহুস সিয়ারের যে বক্তব্য উল্লেখিত হয়েছে, সেখানে স্পষ্টভাবেই এই ধরনের সম্পর্ককে নাজায়েয বলা হয়েছে।

ভুল বুঝার প্রথম কারণ

এই বিষয়ে ভুল বুঝার বাহ্যত কারণ এটাই মনে হয় যে, ফিকহি দৃষ্টিতে এই ধরনের বানিজ্যিক লেনদেনকে সহিহ বলার জন্য শুধুই ক্রয়বিক্রয় সহিহ হওয়ার মৌলিক বিষয়গুলোকেই লক্ষ্য রাখা হয়। অর্থাৎ, অস্ত্র ছাড়া অন্যান্য জিনিসপত্র এই ধরনের রাষ্ট্রগুলোর সাথে ক্রয়বিক্রয়ের সময় শুধুই আকদ সম্পন্ন হওয়া ও আকদ সম্পন্ন হওয়ার পর সহিহ হওয়ার শর্তসমূহ পাওয়া গিয়েছে কি না, তাই বিবেচনায় রাখা হয়। যার ফলে ফিকহে দৃষ্টিতেও এইধরনের বিক্রি সঠিক বলে মনে হয়। কিন্তু বাস্তবতা হলো, এটা অসম্পূর্ণ অধ্যায়ন। আহলে ইলমের কাছে এই বিষয়টি অজানা নয় যে, ফিকহি দৃষ্টিতে কোনো চুক্তি জায়েয ও শরীয়ত সম্মত হলেই উক্ত কাজ প্রায়োগিকভাবে জায়েয হওয়া আবশ্যক হয় না। বরং অনেক আকদ এমন আছে যা চুক্তির শর্ত বিবেচনায় তো সহিহ বলা হবে, কিন্তু তারপরও তা নাজায়েযই থেকে যাবে। এবং এইধরনের চুক্তির ফলে ব্যক্তি গুনাহগারও হবে। ফিকহি পরিভাষায় যে চুক্তিগুলোকে 'বাইয়ে মাকরুহ' বলা হয়, সেগুলোর মৌলিক বিষয় এটাই যে, চুক্তিগুলো সহিহ হওয়ার শর্ত তো পাওয়া গিয়েছে, কিন্তু অন্য আরোপিত কিছু সমস্যা তাতে যুক্ত হয়েছে।

উল্লেখিত সুরতে অবৈধ হওয়ার কারণ দুটি :

এক. অন্যায় কাজে সহযোগিতা করা হয়। এজন্যই জুমআর আযানের সময় অথবা কাউকে ধোকা দিয়ে ক্রয়-বিক্রয় করা জায়েয নেই, বরং অন্যায়-অপরাধ ও নিন্দিত কাজ বলে গণ্য হয়। এই দুই প্রকার লেনদেন শুধুই দ্বীনি আত্মমর্যাদাবোধের কারণে নয়। বরং মাকরূহ বিষয় জড়িত হওয়ার কারণে। ঠিক একইভাবে মুসলমানদের বিরুদ্ধে সরাসরি যুদ্ধে লিপ্ত রাষ্ট্রের সাথেও ক্রয়-বিক্রয় করা জায়েয নেই ।

দুই. মুসলিমদের বিরুদ্ধে যুদ্ধরত কাফেরদের (ব্যক্তি, জাতি বা রাষ্ট্র) সাথে সম্পর্ক রাখা জায়েয নয়। কুরআন-হাদীস থেকে জানা যায় যে, তাদের সাথে শুধু সম্পর্ক ছিন্ন করাই যথেষ্ঠ নয়, বরং সাধ্যমত তাদের সাথে শত্রুতা পোষণ করা আবশ্যক। অনেক ওলামায়ে কেরাম থেকে এরকম কথা স্পষ্টভাবে পাওয়া যায়। যেমন, ইমাম জাসসাস রহিমাহুল্লাহ (মৃত্যু: ৩৭০ হি.) সূরা মায়েদার ৫১ নাম্বার আয়াতের তাফসীরে বলেন,

(قوله تعالى يا أيها الذين آمنوا لا تتخذوا اليهود والنصارى أولياء بعضهم أولياء بعض) مطلب: الكافر لا يكون وليل للمسلم: وفي هذه الآية دلالة على أن الكافر لا يكون وليا للمسلم لا في التصرف ولا في النصرة، ويدل على وجوب البراءة من الكفار والعداوة لهم، لأن الولاية ضد العداوة، فإذا أمرنا بمعاداة اليهود والنصارى لكفرهم فغيرهم من الكفار بمنزلتهم. ويدل على أن الكفر كله ملة واحدة، لقوله تعالى: {بعضهم أولياء بعض}. (أحكام القرآن للجصاص ٢/٥٥٥، تحت سورة المائدة: الآية ٥١
(

আল্লাহর বানী: তোমরা ইহুদি ও খ্রিস্টানকে বন্ধুরূপে গ্রহণ করো না, তারা একে অপরের বন্ধ, এই আয়াত থেকে এটা অকাট্ট প্রমাণিত হয় যে, কাফেররা মুসলমানদের বন্ধু হতে পারবে না, কোনো রকম তাসাররুফের ক্ষেত্রেও নয় এবং কোনো সাহায্য-সহযোগিতার ক্ষেত্রেও নয়। এবং এটাও অকাট্টভাবে প্রমাণিত হয় যে, কাফেরদের সাথে সম্পর্কচ্ছিন্ন এবং শত্রুতা পোষণ করা আবশ্যক। কেননা বন্ধুত্ব শত্রুতার বিপরীত। সুতরাং যখন আমাদের ইহুদি ও খ্রিস্টানের সাথে তাদের কুফরের কারণে শত্রুতা পোষণের আদেশ করা হয়েছে তখন অন্যান্য

কাফেররা তাদের হুকুমেই হবে। "তারা একে অপরের বন্ধু" এই কথা থেকে স্পষ্ট হয় যে, সকল কাফের মূলত একই জাতী।[2]

উল্লেখিত ইবারত থেকে এটা স্পষ্ট যে, কাফেরদের সাথে (বিশেষভাবে যারা মুসলমানদের সাথে যুদ্ধে লিপ্ত) শুধু সম্পর্ক ছিন্ন করাই যথেষ্ঠ নয়। বরং (জরুরতের সময়) শত্রুতা ও সম্পর্ক ছিন্নতা প্রকাশ করাও আবশ্যক।

ভুল বুঝার দ্বিতীয় কারণ

উপরের বর্ণিত মাসআলায় ফিকহি দৃষ্টিতে ভুল হওয়ার আরেকটি মৌলিক কারণ হলো ফিকহি কিছু বক্তব্য। যেগুলোতে বলা হয়েছে হারবিদের সাথে শুধুই যুদ্ধের আসবাব ও উপকরণ বিক্রিই শুধু নাজায়েয, অন্যান্য সাধারণ জিনিষের ক্রয়বিক্রয় নাজায়েয নয়।

আল্লামা কাসানী রহিমাহুল্লাহ বাদায়েউস সানায়ে গ্রন্থে (৭/১৪২) বলেন:

ويكره بيع السلاح من أهل البغي وفي عساكرهم لأنه إعانة على المعصية والا يكره بيع ما يتخذ منه السلاح كالحديد ونحوه لأنه الا يصير سلاحا إلا بالعمل ونظيره أنه يكره بيع المزامير. (بدائع الصنائع ١٤٢/٧، كتاب الغصب)

আল্লামা মারগিনানী রহিমাহুল্লাহ 'হেদায়া' কিতাবেত (২/২৮২) বলেন,

ولا ينبغي أن يباع السلاح من أهل الحرب ولايجهز إليهم لأن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن بيع السلاح من أهل الحرب وحمله إليهم ولأن فيه تقويتهم على قتال

---

[2]. আহকামুল কুরআন ২/৫৫৫, দারুল কুতুবিল ইলমিয়্যাহ

المسلمين فيمنع من ذلك وكذا الكراع لما بينا وكذا الحديد لأنه أصل السلاح وكذا بعد الموادعة لأنها على شرف النقض أو الأنقض فكانا حربا علينا وهذا هو القياس في الطعام والثوب إلا أنا عرفناه بالنص فإنه صلى الله عليه وسلم أمر ثمامة أن يمير أهل مكة وهم حرب عليه . (الهداية ٢/٢٨٢، كتاب السير)

এইধরনের ফিকহি বক্তব্যগুলো থেকে আমাদের আলোচ্য মাসআলায় দলিল দেওয়া সঠিক নয়। কেননা যুদ্ধের সামগ্রি ব্যতিত অন্যান্য আসবাব সর্ববস্থায় হারবীদের সাথে বিক্রি জায়েয, বিষয়টি এমন নয়। বরং তা ব্যাখ্যা সাপেক্ষ। যা আমরা প্রবন্ধের শুরুতে শরহে সিয়ারে কাবিরের উদ্ধৃতিতে পেশ করেছি।

কাফেরদের পণ্য মুসলমানদের থেকে ক্রয় করা

অনেক সময় দেখা যায় যে, যে সমস্ত কাফের রাষ্ট্র সরাসরি মুসলিমদের বিরুদ্ধে যুদ্ধে লিপ্ত তাদের থেকে ইসলামী ভূখণ্ডের কোনো মুসলিম ব্যক্তি অথবা প্রতিষ্ঠান পণ্য ক্রয় করে এবং সে পণ্য সেখানের মানুষদের কাছে বিক্রি করে। অনেকেই এমন মুসলিম ও মুসলমিদের প্রতিষ্ঠান থেকে পণ্য ক্রয় করে অন্যান্য মুসলমানদের জন্য ক্রয়-বিক্রয় করার অনুমতি দিয়ে থাকে। কিন্তু একটু চিন্তা করলেই বুঝা যাবে যে, এরকম ক্রয়বিক্রয় থেকে সর্বদা বিরত থাকা উত্তম। কেননা যদিও সরাসরি হারবী কাফের থেকে সাধারণ মুসলমান ক্রয় করছে না, কিন্তু দিনশেষে তার বেচাকেনার মাধ্যমে কাফের রাষ্ট্রগুলোই শক্তিশালি হচ্ছে। আর বাণিজ্যিক বয়কট না করার সুরতে যে শরয়ী সমস্যা দেখা দিত এবং যেই কারণে বয়কট করার আবশ্যকতা সাব্যস্ত হতো এখানেও তা পরিপূর্ণভাবে বিদ্যমান রয়েছে। অতএব যখন ক্রেতা পাওয়া যাবে এবং

পণ্য বিক্রি হতে থাকবে তখন সম্পৃক্ত মুসলিম ব্যক্তি অথবা প্রতিষ্ঠান অতিরিক্ত পণ্য ক্রয় করতে থাকবে।

ফুকাহায়ে কেরাম একাধিক মাসআলায় এই দিকটিও বিবেচনায় এনেছেন এবং এর উপর ভিত্তি করে একাধিক লেনদেনকে নিষিদ্ধ আখ্যা দিয়েছেন। উদাহরণত, যে ব্যক্তি লোক চলাচলের রাস্তায় বেচাকেনা শুরু করে এবং তার কারণে পথচারীদের চলাচলে কষ্ট হয়, এমন ব্যক্তি থেকে কোনো জিনিস ক্রয় করা থেকে ফকিহগণ নিষেধ করেছেন এই দিকটার বিবেচনা করেই। ফাতাওয়ায়ে গিয়াছিয়্যাহতে উল্লেখ রয়েছে,

من يبيع ويشتري على الطريق ولم يضر قعوده للناس لسعة الطريق لا بأس به، وإن أضر بهم فالمختار أنه لا يشتري منه لأنه إذا لم يجد مشتريا لا يقعد فكان الشراء منه إعانة على المعصية وكذا في الفتاوى الهندية. (الفتاوى الغياثية ص ١٥٣، كتاب البيوع، قبيل الباب السادس في الاستقراض)

যে ব্যক্তি পথের মাঝে বেচাকেনা শুরু করে, কিন্তু রাস্তা প্রশস্ত হওয়ার কারণে মানুষের কষ্ট না হয়, তাহলে কোনো সমস্যা নেই। তবে যদি মানুষের কষ্ট হয় তাহলে গ্রহণযোগ্য মত অনুযায়ী তার থেকে কেউ পণ্য কিনতে পারবে না। কারণ এতে গুনাহের কাজে সহায়তা করা হয়। আর যখন সে খদ্দের না পাবে তখন রাস্তায় এভাবে বসে মানুষকে কষ্ট দেওয়া থেকে বিরত থাকবে। ফাতাওয়ায়ে হিন্দিয়াতেও এরকম আছে।[3]

অতীতের একটি গুরুত্বপূর্ণ ফতোয়া

[3] ফাতাওয়ায়ে গিয়াছিয়্যাহ পৃ. ১৫৩

আজ থেকে আনুমানিক পঞ্চাশ বছর পূর্বে 'মজলিসে আমেলা' একটি প্রশ্নপত্র তৈরী করে, যেই প্রশ্নের জবাব তৎকালীন সময়ে দেশের প্রসিদ্ধ আলেমে দ্বীন মুফতী ওয়ালী হাসান টুংকী রাহিমাহুল্লাহ বিস্তারিত আকারে দিয়েছিলেন। এরপর উপমহাদেশের অসংখ্য আলেম এই জবাবের উপর সমর্থণমূলক স্বাক্ষর করেছিলেন। এই প্রশ্নোত্তর মূলত কাদীয়ানী সম্প্রদায় ও তাদের সাথে যারা সখ্যতা রাখত তাদের ব্যাপারে ছিল। তবে এই ফতোয়া থেকে আমাদের আলোচিত মাসআলার কয়েকটি দিক একেবারে স্পষ্ট হয়ে যায়। উক্ত ফতোয়াতে লেখা ছিল,

'এই বিষয়টি যেন স্পষ্ট থাকে যে, হারবী কাফের, যারা সর্বদা মুসলিমদের বিরুদ্ধাচারন করে, তাদের সর্বদা কষ্ট দেয়, ইসলামী পরিভাষাগুলো মিটিয়ে দিয়ে ইসলামের সাথে উপহাস করে এবং আস্তিনের কালসাপ হয়ে মুসলিমদের ঐক্যবদ্ধ শক্তিকে বিছিন্ন করে দেওয়ার ব্যাপারে এক পায়ে খাড়া, ইসলাম তাদের সাথে কঠিনতর আচরণ করতে আদেশ দেয়। যে কাফের হারবী ও অত্যাচারী নয়, তাদের সাথে সৌজন্যমূলক আচরণের অনুমতি দেওয়া হয়েছে। অন্যথায় হারবী কাফেরদের সাথে শক্ত ব্যবহারের আদেশ দেওয়া হয়েছে।

যেখানে অনেক সময় কোনো মুসলিমের থেকে কোনো জঘণ্য গুনাহ প্রকাশ পেয়ে যায় তাহলে শাস্তি ও নৈতিকতা শিক্ষা দেওয়ার নিমিত্তে তার সাথে সম্পর্ক ছিন্ন, কথা-বার্তা, ওঠা-বসা পরিত্যাগ করার হুকুম শরীয়ত ও সুন্নতে নববীতে বিদ্যমান রয়েছে, সেখানে কাফেরদের সাথে নম্র আচরণতো অনেক দূরের বিষয়! এখন যদি মুসলিম রাষ্ট্র কাফেরদেরকে তাদের পাওনা বুঝিয়ে দিতে গড়িমসি করে বা তাদের

থেকে এই কাজের আশাই না থাকে তাহলে মুসলিমদের উপর এই ফরজ দায়িত্ব আসবে যে, তারা জামাতবদ্ধভাবে সামর্থ্য অনুযায়ী কাফেরদেরকে শাস্তির সিদ্ধান্ত দিবে যা তাদের সাধ্যের মধ্যে রয়েছে।

মোটকথা, ধর্মত্যাগ, যুদ্ধেলিপ্ত হওয়া, বিদ্রোহ, ঔদ্ধত্য, নিফাক, কষ্টপ্রদান, মুসলমানদের সাথে প্রতারণা, ইহুদি-খ্রিস্টান ও হিন্দুদের সাথে মিলে ষড়যন্ত্র- এই প্রত্যেকটা বিষয় একত্রে পাওয়া যাওয়ার কারণে নিঃসন্দেহে প্রশ্নে উল্লেখ করা ব্যক্তি বা দলের সাথে সম্পর্ক ছিন্ন বা বয়কট করা শুধু জায়েয নয়; বরং ওয়াজিব। মুসলিম জামাআতগুলোর ঐক্যবদ্ধ সিদ্ধান্ত যদি এই ফিতনার মস্তক ছিন্ন করার জন্য সম্পর্ক ছিন্ন করা বা বয়কটের মতো সামান্য পদক্ষেপ নিতেও অবহেলা করে তাহলে আল্লাহর সামনে তাদেরকে অবশ্যই জবাবদিহিতা করতে হবে।[4]

উপমহাদেশের সম্পর্কচ্ছেদ আন্দোলনের পটভূমি

ভারত বিভক্তির পূর্বে উপমহাদেশে ইংরেজদের বিরুদ্ধে যেই 'সম্পর্কচ্ছেদ আন্দোলন' হয়েছিলো, যেখানে সর্বস্তরের মুসলমান তাদের সামর্থ্যনুযায়ী কোনোনা কোনোভাবে অংশগ্রহণ করেছিলো এবং যে আন্দোলনের নেতৃত্বের লাগাম ওলামায়ে দেওবন্দের হাতে ছিলো, তাদের দৃষ্টিভঙ্গির সারমর্মও এমনই। এজন্যই শাইখুল হিন্দ মাওলানা মাহমুদ হাসান দেওবন্দী রাহিমাহুল্লাহ বলেছিলেন,

'একটি সংশয় এখানে রয়ে গেছে মুওয়ালাত (বন্ধুত্বপূর্ণ আচরণ) এক জিনিস আর মুআমালাত (পারস্পরিক লেনদেন) আরেক জিনিস। আমি

[4] ফাতওয়ায়ে বাইয়িনাত ১/২২০

এর জবাবে বলব, হ্যাঁ, মুওয়ালাত ও মুয়ামালাত এর মাঝে মর্মগত পার্থক্য থাকলেও মুওয়ালাতের মধ্যে ভাষাগত দিক থেকে আত্মীয়তা, নৈকট্য সৃষ্টিকারী সম্পর্কসমূহ, পরস্পর সাহায্য ও সহযোগিতার সমস্ত পন্থা অন্তর্ভূক্ত। সুতরাং এমন সব মুআমালা যার কারণে শত্রুর সাথে সম্পর্ক ও ঘনিষ্ঠতা বৃদ্ধি পায়, এমন সব লেনদেন যেগুলো তাদের ঔদ্ধত্যপূর্ণ শক্তি বৃদ্ধি করে, এমন সব সম্পর্ক (সামরিক ঘনিষ্ঠতা) যেগুলো মুসলিমদের ধ্বংস ও ইসলামের শান-শওকতকে নিশ্চিহ্ন করে দেওয়ার মধ্যে ভূমিকা রাখে, এমন ঘনিষ্ঠতা যেগুলোর কারণে তারা এমন সুযোগ পেয়ে যায় যে, তারাদের ব্যাপারে মুসলিমরা সন্তুষ্ট এই প্রমাণ পেশ করতে পারে, অথবা এমন কোনো আচরণ ও উচ্চারণ যেগুলোর মাধ্যমে সরাসারি বা ভায়া হয়ে তাদের প্রতি ভালোবাসা ও সৌহার্দ্য প্রকাশ পায়, হারাম ও নিষিদ্ধ মুওয়ালাতের অধীনে প্রবেশ করবে। হাতেব ইবনে আবী বালতায়া রাদিয়াল্লাহু আনহু এর ঘটনা খুব ভালোভাবে ভেবে দেখলে এবং ফারুকে আযম রাদিয়াল্লাহু আনহু এর ইমানী গাইরত লক্ষ্য করলে এই বিষয়ে কোনো সন্দেহই তৈরি হতে পারে না।’[5]

[5] খুতবাতে জমিয়তে ওলামায়ে হিন্দ পৃ. ৮৬